বিশ^বিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) ২০২০ সালের প্রতিবেদনে দেখা গেছে, দেশে বর্তমানে ৬৪টি সরকারি ও ১০৭ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। তার মধ্যে ২৭টি সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা বাবদ কোনো ধরনের অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়নি। দেশের ২৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা কাজের জন্য কোনো বরাদ্দ ছিল না। এসব উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গবেষণা কার্যক্রম ছাড়াই উচ্চতর ডিগ্রির সনদ বিতরণ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ৪৭তম প্রতিবেদনে এমন চিত্র উঠে এসেছে।

এতে করে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা দূরের কথা, শুধু এক ধরনের সনদ প্রদান করা হচ্ছে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে এখনো মুখস্থবিদ্যার ওপর নির্ভর করে ডিগ্রি প্রদান করায় শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। এ অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা কার্যক্রম বাড়াতে হলে বরাদ্দ ও পলিসি নির্ধারণ করার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্ব রয়েছে। কোনোটার শিক্ষার্থী কম, অল্প কয়েকটি অনুষদ চালু থাকায় গবেষণা কাজের জন্য বরাদ্দ রাখা সম্ভব হয়নি। আবার অনেক নতুন বিশ্ববিদ্যালয় চালু হওয়ায় গবেষণা বাবদ তাদের কোনো ধরনের বরাদ্দ রাখা সম্ভব হয়নি। একজন শিক্ষার্থীর উচ্চশিক্ষার সনদ পেতে গবেষণার সঙ্গে সম্পর্ক নেই, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা থাকতে হবে। গবেষণা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় চলবে সেটিও কাম্য নয়। বিশ^বিদ্যালয়গুলো যাতে বেশি বেশি গবেষণা কাজ করে সেজন্য তাগাদা দেওয়া হচ্ছে। এ বাবদ বরাদ্দ বাড়াতেও সরকারকে আহ্বান জানানো হয়েছে। অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বরাদ্দ পায় না বলে গবেষণা করতে আগ্রহী হয় না। এ খাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজ নিজ তহবিল তৈরি করতে হবে। দেশের ইন্ডাস্ট্রিগুলোকে এ বিষয়ে এগিয়ে আসতে হবে। শুধু সরকারি বরাদ্দনির্ভর থাকলে হবে না। কারণ বিশ্ববিদ্যালয় একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। সেটিকে মাথায় রেখে গবেষণার জন্য ফান্ড তৈরি করা যেতে পারে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আসলে টিচিং নাকি গবেষণা করবে সেটি নির্ণয় করতে হবে। টিচিং হলে একটি কোর্স সম্পন্ন করে সার্টিফিকেট দেওয়া কাজ হয়ে থাকে। আর গবেষণা বা রিসার্চ ইউনিভার্সিটি হলে বড় অংশজুড়ে গবেষণা করতে হয়। গবেষণা করতে হলে একটি বড় ধরনের ফান্ড প্রয়োজন হয়।

গবেষণা সংস্কৃতি তৈরি না হলে ফান্ডের সংকট কাটবে না। শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি শিক্ষকদের আগ্রহ তৈরি করতে হবে। শুধু অর্থ দিয়ে তা হবে না। যে উৎস থেকে অর্থ আসছে সেগুলোকেও আমরা কতটুকু কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছি সেটিও ভেবে দেখতে হবে। বাংলাদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় স্থান পায় না টপ ৫০০-এর মধ্যে। তবে প্রতিবেশী দেশ ভারতের বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় সেরা ৫০০ তালিকার মধ্যে রয়েছে। এটা নিয়ে অনেক সমালোচনা হচ্ছে। সমালোচনা হওয়া অবশ্য যৌক্তিক। এ বিষয়ে সরকারের ভাবা দরকার, কেন বিশ্ববিদ্যালয় সেরা ৫০০-তে নেই। বিষয়টি খতিয়ে দেখা দরকার এবং গবেষণা প্রয়োজন।

এক সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান ভালো, কিন্তু এখন র‍্যাংকিংয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে। বিষয়টি আমাদের জন্য হতাশাজনক। কারণ শিক্ষায় ভালোভাবে বা গুণগতভাবে উন্নতি না ঘটলে কোনো উন্নয়ন টেকসই করা সম্ভব নয়। উন্নয়নকে টেকসই করতে হলে শিক্ষায় উন্নয়ন, গবেষণায় বরাদ্দ বাড়াতে হবে। গবেষণার ব্যাপক উন্নতি বা মানসম্মত গবেষণা না হলে শিক্ষা উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে না।

এই র‍্যাংকিংয়ে ৬টি সূচকে মোট ১০০ নম্বরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মূল্যায়ন করা হয়। এর মধ্যে একাডেমিক খ্যাতি ৪০, চাকরির বাজারে সুনাম ১০, শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত ২০, শিক্ষকদের গবেষণা ২০ ও আন্তর্জাতিক শিক্ষক অনুপাত ও আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী অনুপাতে ৫ নম্বর করে ধরা হয়। কিন্তু এ সূচকগুলোতে আমরা অনেক পিছিয়ে রয়েছি। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত মেনে চলা হয় না। যেমন আন্তর্জাতিক মানদ- অনুযায়ী ২০ শিক্ষার্থীর জন্য ১ জন শিক্ষক থাকা দরকার। কিন্তু আমাদের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে সেটা মানা হয় না বা নেই। সেদিকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দৃষ্টি দিতে হবে।

তা হলে শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়ন সম্ভব। একাডেমিক খ্যাতি, চাকরির বাজারে সুনাম বাড়াতে হলে ভালো মানের শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। এখন দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ যোগ্যতায় শিক্ষক নিয়োগ হয়, যা কোনোভাবেই কাম্য নয়। এসব বন্ধ করা সময়ের দাবি। শিক্ষক নিয়োগে শতভাগ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। উপাচার্যদের আরও সতর্ক থাকতে হবে শিক্ষক নিয়োগে এবং স্বজনপ্রীতি বন্ধ করার জন্য। শিক্ষকদের পিএইচডি ও পোস্ট ডক্টরাল গবেষণায় গুরুত্ব না দেওয়া হলে বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাংকিংয়ে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্থান পাওয়া কঠিন হয়ে পড়বে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত বৃদ্ধি করতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে খুবই দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা কমিশন গঠন করতে হবে, যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষকের গবেষণার মান বৃদ্ধি করা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক থেকে অধ্যাপক পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে পদোন্নতি পেতে পিএইচডি ডিগ্রিসহ আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা থাকতে হবে, এ ধরনের নিয়ম করা জরুরি, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংকিংয়ে স্থান পেতে কাজ করবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে গঠনমূলক রাজনীতির পরিবেশ সৃষ্টি করা একান্ত প্রয়োজন।

প্রযুক্তিনির্ভর যুগে প্রযুক্তির জ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ে কম দেওয়া হয়। ফলে প্রযুক্তিনির্ভর দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের সুযোগ কম। এর প্রভাব পড়ে এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থায়। ফলে উন্নত শিক্ষার জন্য দেশের বাইরে স্কলারশিপ নিয়ে পড়তে যায় এখানকার শিক্ষার্থীরা এবং দেশে উপযুক্ত কর্মক্ষেত্রের অভাবে বিদেশে স্থায়ীভাবে থেকে যায় অনেকে। ইউনেস্কোর পরামর্শ হলো, শিক্ষা খাতে বরাদ্দ হবে জাতীয় বাজেটের কমপক্ষে ২০ শতাংশ এবং জিডিপির ৬ শতাংশ। কিন্তু বাংলাদেশ এখনো সেই লক্ষ্যমাত্রা থেকে দূরে অবস্থান করছে।

চলতি অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটেও শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে যে ব্যয় ধরা হয়েছে এই বরাদ্দ প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। একটি উন্নত জাতি ও উন্নত দেশ গঠনে প্রযুক্তিগত, গবেষণাধর্মী ও কারিগরি শিক্ষা খুবই জরুরি। আমাদের দেশে দেখা যায়, শিক্ষার্থীদের মধ্যে চাকরি করার প্রবণতা বেশি, উদ্যোক্তা হওয়ার প্রবণতা খুবই কম। কেননা উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে পান না এখানকার শিক্ষার্থীরা। আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পর্যাপ্ত গবেষণা না হওয়ায় বিশ্ব র‍্যাংকিংয়ে অনেক পিছিয়ে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাজেটের বেশিরভাগ ব্যয় হয় উন্নয়ন কাজে, গবেষণা খাতে বরাদ্দ খুবই কম। মৌলিক জ্ঞান সৃষ্টির জন্য গবেষণার বিকল্প নেই। জ্ঞান সৃষ্টি না হলে শিক্ষকতার মানও নেমে যাবে। ভালো ও উঁচুমানের গবেষণা না হলে তা 'ইমপ্যাক্ট জার্নালে' প্রকাশের জন্য বিবেচনা হয় না। গবেষণা না হলে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ও এগোতে পারে না। এমন পরিস্থিতিতে বৈশ্বিক পরিম-লে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল্যও কমে যায়।

পিএইচডি হচ্ছে একজন শিক্ষকের গবেষণা জগতে প্রবেশদ্বার। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মাত্র এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষকের এই ডিগ্রি আছে- সেটা আশাব্যঞ্জক দিক নয়। যিনি নিজেই পিএইচডি বা গবেষণা করেননি, তিনি কী শিক্ষা দেবেন বা গবেষণায় তত্ত্বাবধান করবেন কীভাবে। উচ্চশিক্ষায় এ ধরনের শিক্ষকের দ্বারা কী হবে- তা বলা কঠিন। তবে ভুল-ত্রুটি শুধরে তারা সামনের দিকে এগিয়ে যাবেন- এমনটি আশা করতে পারি।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে আর্থিক প্রণোদনা অবশ্যই যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, চীন বা জাপানের মতো বরাদ্দ দেওয়া সম্ভব না হলেও যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়, সেটিও যদি সঠিক পথে এবং উপযুক্ত গবেষকদের দ্বারা সম্পন্ন করা হতো তা হলে গবেষণায় বাংলাদেশ এতটা পিছিয়ে পড়ত না। তাই আর্থিক প্রণোদনা অপেক্ষা সঠিক ব্যক্তির কাছে গবেষণার ভার যাচ্ছে কিনা সেটাই বড় সমস্যা। এ দিকটির ওপর অধিক মনোযোগ অত্যাবশ্যক।

বাংলাদেশ শুধু একটা উন্নয়নশীল দেশ নয়, এর অর্থনীতি বিশ্বের সবচেয়ে গতিশীল অর্থনীতিগুলোর একটি; স্বল্প সময়ের মধ্যে দারিদ্র্য বিমোচন করে ২০৪১ সালের মধ্যে একটা উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হওয়া এর লক্ষ্য। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এ লক্ষ্য অর্জন করতে হলে যে উন্নত জ্ঞান, প্রযুক্তি, সর্বোপরি জনবল প্রয়োজন তার জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখায় প্রচুর নিজস্ব গবেষণা দরকার। বলা বাহুল্য বিশেষজ্ঞদের মতে, ওই জ্ঞান-প্রযুক্তি ও জনবল সৃষ্টি করতে না পারলে বাংলাদেশকে অন্য অনেক দেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের ফাঁদে আটকে থাকতে হবে।

হীরেন পণ্ডিত : প্রাবন্ধিক ও গবেষক